

# শারিয়ায় নারী-সাক্ষী।

(১)

(এ নিবন্ধে শারিয়ার একটা দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে। ইসলামের ওপর যে কোন আলোচনার মত এটাকেও অসম্পূর্ণ ধরতে হবে। শারিয়া যেমন সর্বরোগের ধন্যন্তরী নয়, তেমন মুসলমানদের সব সমস্যার মূলও নয়। শারিয়া অনেকগুলো বড় সমস্যার একটা মাত্র। যে কোন ধর্মীয় আইন-ভিত্তিক দেশ প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা অন্য ধর্মীয় আইন-ভিত্তিক দেশ প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টাকে উৎসাহিত করে। এ চেষ্টা বিশ্ব-মানবকে আবেগের দিক দিয়ে খন্ড-বিখন্ড করে, পরস্পরকে ঘৃণার সাথে দূরে ঠেলে দেয়। শারিয়া-ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র-দর্শনে বিশ্বাসীর কোন নৈতিক অধিকার থাকে না ভারতের হিংস্র হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে অথবা ইসরাইলে সম্ভাব্য বিধিবদ্ধ হালাখা-ভিত্তিক ঈহুদী-রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে কথা বলার। শারিয়া-ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্রের নামে বিশ্ব-মুসলমানকে এই ভয়ংকর আত্মঘাতী প্রতিযোগিতায় লিপ্ত না হয়ে সবার সাথে জীবন ও দুনিয়া সমান ও সম্মানজনক ভাবে ভাগ করে বাঁচা শিখতে ও শেখাতে হবে।)

ব্যবসা-বাণিজ্যের বা অন্যান্য দলিলে সই করার সময় ইসলামে নারীর সাক্ষ্য ধরা হয় পুরুষের অর্ধেক (সুরা বাকারা আয়াত ২৮২), সেটা অন্য বিষয়। এ নিবন্ধে শারিয়ার হুদুদ অংশে অবৈধ শারীরিক সংসর্গের সাক্ষ্যের বিষয়ে এক একেকটা অংশে এই আঙ্গিকগুলো নিয়ে আলোচনা করে হবে:- (১) শারিয়ায় চার-সাক্ষীর আইনে কি লেখা আছে, (২) বিভিন্ন ইসলামী আদালতে কিভাবে সে আইনের প্রয়োগ হয়, (৩) সরকারী ও (ফতোয়াবাজের) বেসরকারী আদালতে সে আইনের মামলার বাস্তব উদাহরণ, (৪) কোরাণের যে আয়াত থেকে আইনটা বানানো হয়েছে সে আয়াত এবং সেটা কোথেকে কেন এল কবে এল, (৫) হাদিসে তার উল্লেখ, এবং (৬) আইনটার ভবিষ্যৎ।

শারিয়ার অন্য অংশের নাম হল তা'জির। আলোচ্য আইনটা হুদুদ অংশে পড়ে, যাতে সাতটা অপরাধের আইন আছে, তার মধ্যে এ আইনটা হল জে'না সম্পর্কিত। হুদুদের বৈশিষ্ট্য হল পরিবর্তনের সার্বিক বিরোধীতা। এ কথা বলা আছে আমাদের ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের ২০০১ সালে প্রকাশিত “বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন” বইয়ের তৃতীয় খন্ডের ভূমিকার মধ্যে এগারো পৃষ্ঠায়, - “ইসলামী আইনের যে অংশ কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে এবং যাহা রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নায বিধৃত হইয়াছে সেগুলি অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী। স্থান-কালের পরিবর্তনে তাহাতে সংশোধনের কোন সুযোগ নাই”। সব শারিয়ার বইতে একই সিদ্ধান্ত দেয়া আছে, আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি:- “অন্য আইন-ব্যবস্থার মত ইসলামী আইন-ব্যবস্থায় কোন রকম হ্রাস-বৃদ্ধি, পরিবর্তন-পরিবর্ধন বা প্রতিস্থাপন করা যাইবে না” -পৃষ্ঠা ৪৪, মওলানা ডঃ আবদুর রহমান ডোইয়ের বই- “১৫০০ হিজরিতে শারিয়া, সমস্যা ও সম্ভাবনা”। হুদুদ শব্দটার এখানে উল্লেখ নেই, কিন্তু লেখক ওটাই বুঝিয়েছেন তা তাঁর শারিয়ার ওপরে লেখা অন্যান্য বই থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়। একই কথা মওলানা মৌদুদী আরও কঠিন ভাষায় বলেছেন তাঁর “ইসলামী ল' অ্যান্ড কনস্টিটিউশন” বইয়ের ১৪০ পৃষ্ঠায়:- “যে সকল বিষয়ে স্রষ্টা এবং তাঁহার রসুলের সুনির্দিষ্ট বিধান রহিয়াছে, সে সকল বিষয়ে কোন মুসলিম নেতা, আইনবিদ বা ইসলামী বিশেষজ্ঞ, এমনকি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হইলেও বিন্দুমাত্র রদবদল করিতে পারিবে না”। \*\*\*\*\*

(১)। এবারে আইনটা দেখা যাক। দুনিয়ার অনেক মওলানা বা ইসলামী পণ্ডিত থেকে শুরু করে সাধারণ লেখকদের ব্যক্তিগত মতামতে কি আছে তার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হল ইসলামী আদালতে কি প্রয়োগ করা হয়। কারণ ওটাই মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সময় ১৯৭৯ ও ১৯৮১ সালে পাকিস্তানের আইন হিসেবে শারিয়া গ্রহণ করা হয়েছিল, আমি সেই “টেক্সট অফ পাকিস্তান'স হুদুদ অর্ডিন্যান্সেস”-এর “(২) -১৯৭৯ এর

অর্ডিন্যান্স নম্বর ৭, যাহা ১৯৮০ সালের এর অর্ডিন্যান্স নম্বর ২০ দ্বারা সংশোধিত”- থেকে বাংলায় ভাবানুবাদ করে দিচ্ছি। হুদুদের শাস্তিযোগ্য জ্বেনা (অবৈধ সম্পর্ক) বা জ্বেনা-বিল-জাব্র (ধর্ষণ) এর প্রমাণ হইবে নিম্নলিখিত দুইটির একটিঃ- (১) আদালতের সামনে অভিযুক্ত তাহার অপরাধের স্বীকারোক্তি করে, অথবা (২) চারিজন বয়স্ক পুরুষ মুসলিম সাক্ষী পাওয়া যায় যাহারা স্বচক্ষে শারীরিক মিলন দেখিয়াছে।

কথাটা স্পষ্ট। উদ্ধৃতিটা নেয়া হয়েছে “ক্রিমিন্যাল ল’ অফ ইসলাম অ্যান্ড দি মুসলিম ওয়ার্ল্ড - এ কম্পেয়ারেটিভ পার্সপেক্টিভ” কিতাব থেকে, মিলিয়ে নেয়া হয়েছে অন্য সূত্র থেকেও। বইটা বর্ষীয়ান প্রফেসর ডঃ তাহির মাহমুদের প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর ঐতিহ্যবাহী ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান “ইনস্টিটিউট অফ অবজেক্টিভ স্টাডিজ”- এর প্রকাশিত, ওতে বিরাট এক অধ্যায়ে পাকিস্তানের পুরো হুদু আইনের উদ্ধৃতি আছে, পড়লে সমূহ সন্তোষনীয় আছে। ওই একই কেতাবে, ২৫১ পৃষ্ঠায় চার-নারীর সাক্ষ্যের কথা আবারও লেখা আছে। ভাবানুবাদঃ- “অবৈধ সংসর্গ বা প্রাণদন্ডের যোগ্য কোন অপরাধের ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নহে”।

ইসলামী ফাউন্ডেশনের “বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন” বইয়ের তৃতীয় খন্ডের ৮৮৮ পৃষ্ঠায় আইনটাকে একটু গ্রহণযোগ্য করার প্রচেষ্টা আছে। উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ- “ইবন হাযম লিখিত আল-মুহাল্লা গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে, যেনা প্রমানের ক্ষেত্রে চারিজন ন্যায্যপরায়ণ মুসলমান সাক্ষী হইতে হইবে অথবা প্রতিজন পুরুষের পরিবর্তে দুইজন মুসলিম ন্যায্যপরায়ণ মহিলা হইতে হইবে”।

প্রথমতঃ, চেষ্টাটা ভালো। এবং দরকারী। কিন্তু এই চেষ্টার পরেও নারীর চাক্ষুষ সাক্ষ্য অনৈতিকভাবে অপমানজনকভাবে পুরুষের অর্ধেক থেকে গেল, আর অমুসলিমের চাক্ষুষ সাক্ষ্যও অনৈতিকভাবে অপমানজনকভাবে সম্পূর্ণ বাদ দেয়া হল। দ্বিতীয়তঃ, ইসলামের চারিজন জুরিষ্ট বা আইনবিদ হলেন ইমাম আহমদ (যাঁকে “ইমাম আজম”, অর্থাৎ “সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম” বলা হয়), ইমাম মালিক, ইমাম হাম্বল ও ইমাম শাফি’ই। এঁদের বাদ দিয়ে ইবন আযমের ভিত্তিতে আইন বানাতে তা ভালো হলেও অনেকে মানবে না। মালয়েশিয়া, পাকিস্তান বা নাইজিরিয়ার (৩৬ প্রদেশের ১২টিতে) আদালতে ইবন আজমের এই মতবাদ গ্রহণ করা হয়নি। ইমাম আজমই ইমাম ইবন আজম কি না, বলতে পারব না, বইতেও বলা হয়নি। তবে খোদ ইমাম শাফি’ই বলেছেন, ভাবানুবাদঃ- “অস্বাভাবিক শারীরিক সম্পর্কের সাক্ষ্য হিসাবে চারিজন পুরুষ সাক্ষী প্রয়োজন”- পৃষ্ঠা ৬৩৮, আইন নম্বর- ৩২৪.৯। এটা নেয়া হয়েছে ইমামের “রিলায়ান্স অফ দি ট্র্যাভেলার- এ ক্ল্যাসিক ম্যানুয়াল অফ ইসলামিক স্যাক্রেড ল” বইটা থেকে যে বইকে মিসরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর মৌলিক আইন বলে সার্টিফিকেট দিয়েছে। আরও একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি, “দি পেনাল ল’ অফ ইসলাম” বইয়ের (কাজী পাবলিকেশন্স, লাহোর) ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠা থেকেঃ- অবৈধ সম্পর্কের মামলায় প্রয়োজনীয় সাক্ষী হইল চারিজন বয়স্ক পুরুষ .....নারীদের সাক্ষ্য এই ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নহে। .....বোধশক্তির দুর্বলতা, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা ও (পরিস্থিতিকে) আয়ত্তে রাখিবার ক্ষমতার অভাবের জন্যই নারীদের সাক্ষ্য প্রথম হইতেই গ্রহণযোগ্য নহে”।

দয়া করে এ নিবন্ধের তথ্যগুলোকে আপনাদের সুত্র দিয়ে মিলিয়ে নেবেন। অধুনা ইন্টারনেটের অনেক ওয়েবসাইটে আর মওলানাদের বইতে এই একই ভাবে নারীর সাক্ষীকে অস্বীকার করা হয়েছে, দৈবাৎ দু’একটা সাইটও চোখে পড়ে যাতে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। কিন্তু তাতে ইসলামী আদালতের আইন বদলায় নি। এর পরে আমরা একে একে দেখতে চেষ্টা করব (২)বিভিন্ন দেশে সরকারী ও বেসরকারী (ফতোয়াবাজীর) ইসলামী আদালতে কিভাবে সে আইনের প্রয়োগ হয়, (৩) আদালতে সে আইনের মামলার বাস্তব উদাহরণ, (৪) কোরাণের যে আয়াত থেকে আইনটা বানানো হয়েছে সে আয়াত এবং সে আয়াতটা কোথেকে কেন এল কবে এল, (৫) হাদিসে আইনটার উল্লেখ, এবং (৬) আইনটার ভবিষ্যৎ। এ নিবন্ধে কোথাও ত্রুটি বা ঘাটতি থাকলে তা তত্ত্ব ও তথ্য দেখিয়ে দেবেন।

## শারিয়ায় নারী-সাক্ষী।

(২)

An'ay Ÿ ker Vr An'ay Ÿ seH,  
tb GŸa tær Ÿn tŸsm deH|

এবারে, আদালতে এ আইনের প্রয়োগ।

প্রথম পর্বে আমরা দেখেছি, শারিয়ার অবৈধ সম্পর্কের মামলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মতে এবং পাকিস্তানের শারিয়ামতে চারজন বয়স্ক মুসলিম পুরুষ লাগবে, নারীদের সাক্ষ্য এ মামলায় গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা এটাও দেখলাম, বাংলাদেশের বিধিবদ্ধ শারিয়ার বাংলা বইতে দুর্বল সূত্রে হলেও নারীকে অন্তর্ভুক্ত করার ভালো একটা অসম্পূর্ণ চেষ্টা আছে, “প্রতিজন পুরুষের পরিবর্তে দুইজন মুসলিম ন্যায়পরায়ণ মহিলা হইতে হইবে”। আরও খোলাসা করে বলা আছে, “যেমন তিনজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা বা দুইজন পুরুষ ও চারিজন মহিলা অথবা একজন পুরুষ ও ছয়জন মহিলা বা শুধুমাত্র আটজন মহিলা”। অন্যান্য দেশে প্রচলিত শারিয়ায় এটা নেই কেন, একই ইসলামের বিভিন্ন আইন কেন, তা বলা থাকলে ভালো হত। এমনিতেও একই ব্যাপারে নানা রকম ইসলামী আইন নানা রকম ইসলামের প্রমাণ হতে বাধ্য। কিন্তু কথা সেটা নয়। কথা হল, আইন তৈরী করেন পন্ডিতেরা। আর প্রয়োগ করেন উকিল-মোক্তারেরা। উকিল-মোক্তারের মত তঁাদোড় পেশা দুনিয়ায় আর নেই। আইনের ভেতর সূঁচের পেছনের মত ছিদ্র পেলেই তাঁরা সেখান দিয়ে অবলীলাক্রমে হাতী পার করে দেবেন। বিধিবদ্ধ শারিয়ার এই প্রচেষ্টায় তেমনি ছোট-বড় দু’টো ছিদ্র রয়ে গেছে।

ছোট ছিদ্রটা হল, ন্যায়পরায়ণ মহিলা কাহাকে বলে কত প্রকার ও কি কি, আদালতে উপস্থিত মহিলা-সাক্ষীটা কেন খুবই “অন্যায়পরায়ণ” বলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়, সে কবে কোথায় পুরুষ সহপাঠির সাথে নিউমার্কেটে বই কিনতে গেছে কিংবা বেগানা পুরুষের সাথে বায়তুল মোকাররমে ঘুরেছে তা নিয়ে আদালতে বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টি করা উকিল-মোক্তারের পক্ষে ডাল-ভাত। আর বড় ছিদ্রটা হল, রোকেয়া হলে ধর্ষণের মামলায় যদি সাতজন মেয়ের চাক্ষুষ সাক্ষী থাকে, তবে ধর্ষক সবার সামনে অটহাসি হাসতে হাসতে পগার পার হয়ে যাবে। প্রশ্নটা মোটেই উড়িয়ে দেবার মত নয়। এই দেখুন বাস্তব প্রমাণঃ- এন-এফ-বি’র বরাতে দৈনিক স্টার, ৭-ই জুলাই ২০০৩। কল্যাণপুরে মা-কে বেঁধে কিশোরী মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে শেষ রাতে। ধর্ষণের একমাত্র সাক্ষী হল মেয়ের মা, ধর্ষক হল স্থানীয় তিন লোক। এখন এই মামলা যদি শারিয়া কোর্টে ওঠে তবে শারিয়ার আইন অনুযায়ী এক নারীর সাক্ষ্য ধর্ষকদের শাস্তি দেয়া সম্ভব নয়। গ্রামের নির্জন ধানক্ষেতে ধর্ষিতা অভাগিনীদের একক সাক্ষ্যও সম্ভব নয়।

আমি যুক্তির কথা বলছি। আমি সাধারণ কল্যাণবোধের, ন্যায়ের এবং মানবতার কথা বলছি।

এ ধরনের হৃদয়বিদারক ঘটনা দেশে মাঝে মাঝেই ঘটছে। আজকাল বাংলাদেশে ধর্ষকদের পোয়াবারো। বিশেষ করে গ্রামের গরীব বাপ-মায়ের মেয়েগুলো যেন মাস্তান ছেলেগুলোর লুটের মাল, ওদের বাঁচাবার জন্য মুরব্বী নেই, পুলিশ নেই, আদালত নেই, সরকার নেই, আমরাও নেই। আইনটা মেরামত করে ধর্ষিতার সাক্ষ্য ধর্ষকের শাস্তি সম্ভব নয় কারণ আগের নিবন্ধে দেখিয়েছি, হুদুদ হল যেন হাজার ভোল্টের ইলেক্ট্রিক তার। ওতে হাত ছোঁয়াবার উপায় নেই কারো। কারণ, “কোন মুসলিম নেতা, আইনবিদ বা ইসলামী বিশেষজ্ঞ,

এমনকি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হইলেও বিন্দুমাত্র রদবদল করিতে পারিবে না”।

এই “রদবদল করিতে পারিবে না”-টা রাজনৈতিক ইসলামকে কি মারাত্মক ভাবে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করে রেখেছে, কিভাবে বিশ্ব-মুসলিমকে পেছনে টেনে রেখেছে তার জ্বলন্ত উদাহরণ সর্বত্র বিপুলভাবে ছড়িয়ে আছে পাকিস্তান-নাইজিরিয়ার সরকারী আদালত থেকে শুরু করে আমাদের গ্রামের ফতোয়াবাজীর আদালত পর্যন্ত। সামনে বিপদ দেখলে বড়ই সোহাগের প্রেমিকাটাকে গর্ভবতী অবস্থায় অসহায়ভাবে পেছনে ফেলে বিদ্যুৎবেগে চম্পট দেয়াটা আবহমান পুরুষ-সংস্কৃতি। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যালের মুখ থেকে পুরোটাই শুনতে পারবেন। আমিনা পরকীয়া প্রেমে সন্তানের মা হয়েছে বলে শারিয়া আদালতের রায়ে পাথরের আঘাতে মৃত্যুদন্ড পেয়েছে, আগামী আগষ্ট মাসে সুপ্রীম কোর্টে তার আপিলের চূড়ান্ত রায় হবে। হতভাগিনী আমিনা আদালতে শপথ করে যে প্রেমিকের নাম বলেছে, সে ব্যাটা ছাড়া পেয়ে গেছে কারণ সে নিজের অপরাধ সটান অস্বীকার করেছে, যেন ধোয়া তুলসীপাতা আর কি। কেননা ধর্মণের চারজন মুসলমান বয়স্ক পুরুষের চাক্ষুষ সাক্ষী পাওয়া আর মুরগীর দাঁত ওঠা একই কথা।

দেশ-বিদেশের সরকারী আদালত আর আমাদের গ্রামের অবৈধ বেসরকারী ফতোয়ার আদালতে এই একই আইনের জয় জয়কার। পাপিষ্ঠকে সাজা দিতে শারিয়ার সরকারী আদালতে পাকিস্তানের জাফরান বিবির সাক্ষ্যও কাজে আসে নি, নাইজিরিয়ার আমিনার সাক্ষ্যও কাজে আসে নি। কাজে আসেনি বাংলাদেশের বেসরকারী অবৈধ ফতোয়ার আদালতেও। গ্রামের অজ্ঞ মোল্লা শারিয়ার আইন জানে না বা অপপ্রয়োগ করে, কথাটা ঠিক নয়। পরে অন্যান্য ঘটনায়ও আমরা দেখব ফতোয়াবাজেরা শারিয়ার আইনই প্রয়োগ করে, সে আইন এড়িয়ে যাবার বা নুতন আইন বানাবার মত বুকের পাটা ওদের নেই। মোটামুটি ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে চার বছরে ৩৪৮টি গ্রাম্য ফতোয়ার ঘটনা খবরের কাগজে উঠেছে, আসল সংখ্যা নিশ্চয়ই আরও অনেক বেশী। এর ভেতরে আছে প্রচুর অবৈধ সংসর্গের ফতোয়া, যার পুরো শাস্তি পেয়েছে শুধু নারীরা-ই। দু’একটা ছাড়া কোন পুরুষের শাস্তি হয়নি, নারীর সাক্ষ্য কোনই কাজে আসেনি। কোনদিন আসবেও না।

তাই মানবতার ও ন্যায়বিচারের রক্তাক্ত লাশের ওপর গৃধিনীর হিংস্র চীৎকারে উদ্ভাছ নৃত্যে চিরকাল শারিয়ার হবে জয় জয়কার। শারিয়ার আইনে প্রেমিকা খুন হবে পাথরের আঘাতে, রক্তাক্ত হবে বেতের আর ঝাঁটার আঘাতে, অসহ অপমানে আত্মহত্যা করবে আর প্রেমিক অন্য প্রেমিকা জুটিয়ে বগল বাজিয়ে বেড়াবে দুনিয়ার সামনেই। যেহেতু দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হইলেও বিন্দুমাত্র রদবদল করিতে পারিবে না, তাই হুদুদের এই আইনে ডি-এন-এ টেস্টের অকাট্য বিজ্ঞান প্রয়োগ করে পাপিষ্ঠের পিতৃত্ব প্রমাণ করার কোন উপায় নেই। আইনটাকে বিজ্ঞান দিয়ে উন্নীত করে অপরাধীকে শাস্তি দেবার কোন উপায়ই নেই শারিয়া-ভিত্তিক রাজনৈতিক ইসলামের।

একেই বলে মুসলমানের সখাত সলিল। যুগান্তরের ওপারের মরু-সমাজের কিছু ঘটনার ওপরে তাৎক্ষণিক কিছু বিধানকে আল্লা-রসুলের নামে বিশ্ব-মুসলিমের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে চিরকালের জন্য। ভারতের আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ারের মত কিছু ইসলামী দার্শনিক কত না চীৎকার করে যাচ্ছেন এর বিরুদ্ধে। কোরাণের অনুবাদকারী মহাম্মদ আসাদ তীব্র ভাষায় আক্ষরিক ভাবেই বলেছেন যে উন্যাদ না হলে, মাথা ঠিক থাকলে (ইন ইনসেন মাইন্ড) শারিয়ার চার সাক্ষীর আইন মেনে চলা সম্ভব নয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা। কেতাবের অক্ষর, শব্দ আর বাক্যগুলোই ইসলাম হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক ইসলামের হাতে, তার অন্তর্নিহিত দর্শনটা নয়।

\*\*\*\*\*



# শারিয়ায় নারী-সাক্ষী।

(৩)

(যেসব বিচারকের কাছে এই মামলা পেশ করা হয়, তারা প্রমাণের জন্য চার জন যোগ্য সাক্ষী তলব করবেন এবং এই সাক্ষীদের পুরুষ শ্রেণীভুক্ত হওয়াও জরুরী। এ ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় - পৃষ্ঠা ২৪১, বাংলা কোরাণ, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান)।

মোদা কথাটা হল, কোরাণের ঘটনাহীন মানবিক মূল্যবোধের আয়াতগুলো নিয়ে শারিয়া বানাতে তখনই বিশ্ব-মানবকে চিরকালের জন্য এখনকার ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস দিতে পারত মুসলমানেরাই, দুনিয়াকে এত শতাব্দী অপেক্ষা করতে হত না। দুনিয়ার অনেক আইনেই কোরাণের চিরন্তন মানবিক মূল্যবোধ সাফল্যের সাথে প্রতিফলিত আছে। একটা উদাহরণ- ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশগুলোর গঠনতন্ত্রে আর ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস-এর ১৮ নম্বর আর্টিকেল-এ ছবছ কোরাণের বাণী লেখা আছে- লা ইকরাহা ফিদ-দ্বীন, লা'কুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন। দুর্ভাগ্য, হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী-তে বিশ্ব-শান্তির অন্ততঃ একটা দিগদর্শন যা থেকে পাওয়া যেত, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সেই চমৎকার আয়াতটার জায়গা হয়নি শারিয়ায়।

চারজন পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষ্যের কথা বলা আছে বিশেষভাবে সুরা নূর-এর আয়াত ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত। আর সাধারণ ভাবে আছে সুরা নিসার আয়াত ১৫-তে। এখানে আয়াতগুলোর উদ্ধৃতি দেয়া হলনা লম্বা হয়ে যাবে বলে, আপনারা মিলিয়ে নেবেন। এমনিতে মারফতির গায়েবী-বাতেনি ( কোরাণের উনিশ, বা ক্বাফ ইত্যাদি) ব্যাপারগুলো ছাড়া দুনিয়াদারির জাহেরি ব্যাপারগুলো কোরাণে খুবই সুস্পষ্ট। খোদ কোরাণই নিজেকে সুস্পষ্ট কেতাব ঘোষণা করেছে বার বার, সুরা ইমরান-৭, সুরা মুজাদালাহ- ৫, সুরা ক্বামার- ২৭, সুরা ক্বামার- ২২, সুরা ক্বামার- ৩২, সুরা ক্বামার- ৪০, সুরা দোখান- ২, সুরা যুখরুক- ২, সুরা কাসাস- ২, সুরা আশশো'আরা- ২, সুরা নূর- ২, সুরা হজ্ব- ১৬, সুরা হিজর- ১.....। কিন্তু কোরাণের যে কোন অনুবাদে তফসিরের অংশটা বিপুল এবং ভারী প্যাঁচালো, মোটেই সুস্পষ্ট নয়। এবং অল্পশিক্ষিত অধর্শিক্ষিত মানুষের মানসে ওই তফসিরটাও কোরাণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে বসে যায়। আর, বিভিন্ন তফসিরে ফারাক হতে বাধ্য কারণ ভ্রান্তিময় মানুষের ব্যাখ্যা ছাড়া তফসির আর কিছু নয়।

সুরা নূরের আয়াতগুলো এসেছে ৫ম হিজরিতে মদিনায়। আয়াতগুলোর বাস্তব পটভূমি আছে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসিন খানের বোখারির অনুবাদে, -৫ খন্ড পৃ-৩১৯ থেকে ৩২৯, হাদিস# ৪৬২। ১১ পৃষ্ঠার বিশাল হাদিস, স্বয়ং বিবি আয়েশার বর্ণনা করা। পঞ্চম হিজরির রমজান মাসে বনি মুস্তালিক গোত্রের সাথে গাযওয়ার শেষে নবীজীর কাফেলা ফিরতি-পথে মদিনার কাছেই রাত্রিয়াপনের জন্য থেমেছিল। (গাযওয়া- যে জিহাদে নবীজী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতির জিহাদ হল স্যারিয়া। ৪র্থ হিজরিতে দু'টি, ৫ম হিজরিতে পাঁচটি এবং ৬ষ্ঠ হিজরিতে তিনটি গাযওয়া হয়েছে)। তারপরে রওনা হবার সময় বিবি আয়েশা প্রাকৃতিক কারণে দূরে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে দেখেন তাঁর গলার হারটি নেই। তিনি সেটা খুঁজতে যাবার পর লোকেরা ভুল করে তাঁর হাওদার (পাঙ্কি জাতিয়) ভেতরে তিনি আছেন মনে করে (তিনি ক্ষীণকায়ী ছিলেন) সেটা উটের পিঠে চড়িয়ে কাফেলা রওনা হয়ে যায়। তিনি হারটি পেয়ে ফিরে এসে কাফেলা না দেখে সেখানে অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েন এবং সারারাত ঘুমিয়ে থাকেন। সেকালে প্রতিটি কাফেলার কিছুটা পেছনে একজন লোক হেঁটে আসার রেওয়াজ ছিল, যাতে কিছু খোয়া গেলে তা পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে ছিলেন সাফওয়ান (ক্রীতদাস- ইবনে হিশাম থেকে) তিনি সকালে সেখানে পৌঁছলে বিবি আয়েশা সাফওয়ানের উটে চড়েন এবং সাফওয়ান উটের (সামনে বা পেছনে, বিতর্ক আছে) সাথে হেঁটে হেঁটে কাফেলার কাছে পৌঁছান। পরে এই নিয়ে একদল লোক, প্রধানতঃ আবদুল্লা বিন উবাই,

মিশতাহ আর হাসান বিন খাবিত কানাঘুসা ও অপবাদ শুরু করে। কোন কোন সুত্রে এই তিনজনের সাথে নবী-পত্নী জয়নাবের বোন হামনার নামও পাওয়া যায়। অর্থাৎ সব মিলে তিনজন পুরুষ আর একজন নারী হল। বিবি আয়েশা বাপের বাড়ী চলে যান এবং অত্যন্ত মানসিক কষ্টে দিন কাটাতে থাকেন। মাসখানেক ধরে অনেক তর্ক-বিতর্ক ও সংবেদনশীল ঘটনার পর নবীজী তাঁর বাসায় এলে বিবি আয়েশা এবং তাঁর বাবা-মা, এই তিনজনের সামনেই সুরা নূরের ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত দশটি আয়াত নাজিল হয়। আয়াত নাজিলের পরে, বোখারির উদ্ধৃতিঃ-“আমার মাতা আমাকে বলিলেন- তাঁহার (নবীজীর) কাছে যাও। আমি বলিলাম-আল্লাহ’র নামে, আমি তাঁহার কাছে যাইব না এবং আমি আল্লাহ ছাড়া কাহারও প্রশংসা করি না। সে জন্যই আল্লাহ এই দশটি আয়াত নাজিল করিয়াছেন (সুরা নূর, আয়াত ১১ হইতে ২০ পর্যন্ত)। আল্লাহ আমার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্যই কোরাণের ওই আয়াতগুলি প্রেরণ করিয়াছেন” - উদ্ধৃতি শেষ। অর্থাৎ আয়াতগুলো এসেছিল ওই তাৎক্ষণিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিবি আয়েশার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্যই। ভেবে দেখুন, কার সাথে কি! কোথায় চোদ্দশ’ বছর আগের নির্দোষিতা প্রমাণের একটা ঘটনা, আর কোথায় জেঁনার আদালতে চিরকালের নারীর সাক্ষ্য! এরই ভিত্তিতে চিরকালের জন্য মা-বোনের চাক্ষুষ সাক্ষ্যকে নির্লজ্জ ভাবে কি করে অস্বীকার করব আমরা?

এবারে সুরা নিসার পটভূমি, অর্থাৎ কন্টেক্সট। নিসা-র ১৫ নম্বর আয়াতটায় চার সাক্ষীর যে শর্ত, সেই ব্যাপারের উদ্ধৃতিঃ- “এ শর্ত আরোপের কারণ, যাতে স্ত্রীর স্বামী, তার জননী অন্য স্ত্রী অথবা ভাই-বোন ব্যক্তিগত জীঘাংসার বশবর্তী হয়ে অহেতুক অপবাদ আরোপ করার সুযোগ না পায় অথবা অন্য অমঙ্গলকারী লোকেরা শত্রুতা-বশতঃ অপবাদ আরোপ করতে সাহসী না হয়।” - উদ্ধৃতি শেষ। এই আয়াতে “ফাহিসাহ” শব্দটা জেঁনা ছাড়াও প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ, - প্রকাশ্য মন্দকাজ, -সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজ, - এ ধরনের ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সুরা আরাফ আয়াত ২৮, সুরা আহযাব আয়াত ৩০ আর সুরা ত্বালাক আয়াত ১ -এ।

শারিয়ার আইন কি ওই ব্যাপক অর্থ বা ওই বিশেষ পটভূমি মেনেছে? না কি অন্যান্য অনেক আইনের মত এখানেও সাংঘাতিক রকমের আউট অফ কন্টেক্সট হয়েছে? (কোরাণ অমান্যের আরও উদাহরণ পরে দেয়া হবে)। ওহুদ যুদ্ধের পর মেয়েদের ও এতিমদের ওপরে নানা রকম অত্যাচার-অনাচার হচ্ছিল, মেয়েদের ওপরে খামাখা অপবাদও হচ্ছিল খুব। সেই অনাচারের বিরুদ্ধে তর্জনী তুলে দাঁড়িয়ে গেল এই আয়াত, এটাই এই আয়াতের একমাত্র পটভূমি। অত্যাচারী পুরুষতন্ত্রের জোঁকের মুখে একসাথে পড়ল নুন আর হুঁকোর পানি, কচ্ছপের মত মুখ ঢুকিয়ে ফেলল সে খোলসের ভেতর। অপছন্দের বৌগুলোকে চরিত্রহীনতার অপবাদ দিয়ে আগে বেশ ঝেড়ে ফেলে পার পাওয়া যেত, এখন আনতে হবে চার-চারজন পুরুষ সাক্ষী। না হলে পশ্চাদ্দেশে সবেগে বেত্রাঘাত। ভেবে দেখুন, কার সাথে কি! কোথায় চোদ্দশ’ বছর আগের অপবাদের ঘটনা, আর কোথায় জেঁনার আদালতে চিরকালের নারীর সাক্ষ্য! এরই ভিত্তিতে চিরকালের জন্য মা-বোনের চাক্ষুষ সাক্ষ্যকে নির্লজ্জ ভাবে কি করে অস্বীকার করব আমরা? ভাবতে অবাক লাগে, যে আয়াতগুলো এসেছিল বিবি আয়েশা আর অন্যান্য নারীদেরকে বিশেষ ঘটনায় পুরুষের নাহক হিংস্র ছোবল থেকে বাঁচাতে, সে একই আয়াত আজ কালনাগের মত এঁটে বসেছে নারী-অধিকারের গলায় চিরকালের জন্য।

ইসলামের সে আইনদাতা আজ নেই, নেই সে আইনের ব্যাখ্যাদাতা। তাই চলেছে নারী-সম্মানের হরির লুট, তাঁরই নামে। সেই পরিস্থিতিতে যা ছিল তা ছিল, পস্পরবিরোধী তথ্যে-তত্ত্বে সে দলিলগুলো এতই বিকৃত করা হয়েছে যে তার সম্পূর্ণ ছবি আমরা কোনদিনও পাব না। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মানবাধিকার-সচেতন বর্তমান বিশ্বে যদি তিনি ফিরে আসতেন তবে কখনো তিনি মা-বোনের চাক্ষুষ সাক্ষ্যকে নিয়ে অসম্মানের এ নিষ্ঠুর কালখেলা খেলতেন না। নিজে তো করতেনই না, কেউ করলেও জুলফিকার হাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। তাই বুঝি বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছিলেন, একমাত্র ঐ নেতাটা ফিরে এলেই মানবতার বর্তমান অধঃপতন রোধ করা সম্ভব। পয়গম্বর হিসেবে নয়, এক অবিশ্বাস্য নেতৃত্বের নেতা হিসেবেই কথাটা

বলেছিলেন তিনি।

সে অযোধ্যা নেই সে রামও নেই। কিন্তু মাহমুদ তা'হা-দের ইসলামী চোখে আছে মানবতার স্বপ্নীল রামধনু। আর গোলাম আজমদের পিছলামি হাতে আছে নারী-সম্ভ্রম আর নররক্ত-সিক্ত রক্তাক্ত রাম দা'।

অনেক বেদনায় এ ধরণের নিবন্ধ লিখতে হয়।

\*\*\*\*\*

## শারিয়ায় নারী-সাক্ষী।

(৪)

(এ নিবন্ধ লেখা হচ্ছে শারিয়ার আদালতে প্রয়োগকৃত আইন নিয়ে, যা মানুষের জীবন নির্ধারিত করে। আদালতের প্রয়োগকৃত শারিয়ার ওপরে অনেক মুসলম চিন্তাবিদের অনেক আপত্তি এবং মূল্যবান মলতামত আছে কিন্তু সেগুলোর প্রভাব জীবনের ওপর নেই)।

জামাতের মাথাটা খাঁটি লোহা দিয়ে তৈরী। ওই মাথার ভেতরে মানুষের জীবনের চেয়ে মানুষের বানানো কোরাণের ব্যাখ্যাটা-ই বেশি দামী। যেহেতু কবিতা-গজল বা ফুলের সুগন্ধের পক্ষে লোহা ভেদ করা সম্ভব নয়, তাই ওই মাথায় মানবাধিকারের মর্মবাণী ঢোকানোও আমার চোদ্দগুটির পক্ষে সম্ভব নয়। নিজেদের মা-বোনের চাক্ষুষ সাক্ষ্যকে আল্লার নামে অস্বীকার করাটা যে কতখানি লজ্জার আর কলংকের, সে উপলব্ধি যার আছে, তার আছে। যার নেই, তার কোনকালে হবে না। আমি কথা বলছি শুধু অরাজনৈতিক পুর্যালিস্টিক মুসলমানদের সাথে, যাঁরা বোঝেন যে দুনিয়াটা সবাই মিলে সমানভাবে উপভোগ করতে হবে, ওটা শুধুমাত্র মুসলমান পুরুষদেরই বাপের সম্পত্তি নয়।

সাক্ষীর কচকচি অনেক হল, এবার একটু মুখ বদলানো যাক। তারপর এই শিবের গীতের ভেতর দিয়েই শেষের দিকে আমরা আবার নারী-সাক্ষ্যের ধান ভানব।

নিজের বাচ্চা আর পরের বৌ নাকি পুরুষের একেবারে জানের জান। বিয়ের দু'চার বছরের মাথায় কর্ণকুহরে কুহরিত হয়, - “হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে..... ঘরেতে এলোনা সে তো, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া.....” -(কবিগুরু)। নিষিদ্ধ ফল তো সর্বদাই সুস্বাদু। অপ্রতিরোধ্য তার আহ্বান, একেবারে যেন হ্যামিলনের যাদুর বাঁশী। তাই বুঝি নিষিদ্ধ ফল গন্ধমের অমোঘ আকর্ষণে মানুষ ছিটকে পড়েছে বেহেশত থেকে দুনিয়ায়, তাই বুঝি মানুষের ইতিহাস পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে আবেগ থেকে কাম, কাম থেকে অপরাধ আর অপরাধ থেকে শাস্তি পর্যন্ত, মহাভারতের মুনিঋষি-দেবতা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক পাদ্রী আর কোরাণের গৃহশিক্ষক, পরনারী রাধার সাথে শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর গোপীকামিনী - কবিগুরুর নষ্টনীড় আর তারশংকরের মরমী অনন্যা সেই ঠাকুরঝি (উপন্যাস-কবি) -সম্রাট অষ্টম জর্জের মিসেস সিম্পসন, ডঃ জিভাগো-র ল'রা, কোরাণে জুলেখার প্রবল “ওয়ান সাইডেড”র হজরত ইউসুফ আর যার জন্য সুবিশাল সাম্রাজ্য ত্যাগ, প্রাচীন চীনের সম্রাট শু-চি'র সেই সড়কিয়া, অর্থাৎ রাস্তার পতিতা প্রেয়সী পর্যন্ত। তারপর যখনি থরথর আবেগ-কম্পিত “অন্তর কেবল, - অপের সীমান্ত-প্রান্তে উড্ডিসিয়া উঠে” (কবিগুরু), তখনি সচকিত হয়ে ওঠে সমাজের নৈতিক কাঠামো। সচকিত হয়ে ওঠে কোরাণ, বজ্র-গস্তীর উচ্চারিত হয় - “ব্যভিচারিনী নারী ব্যভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশত করিয়া বেত্রাঘাত কর.....”। উদ্যত তর্জনীতে ছুটে আসে রক্তচক্ষু শারিয়া- “যদি অপরাধীর ক্ষমতা ছিল সৎ থাকিবার, তবে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড.....

এক মিনিট! এক মিনিট!! এটা কেমন হল? কোরাণে শারিয়ায় তফাৎ কেন হল? এমন তো হবার কথা নয়! কোথাও কি কুশের মত ছোট্ট অথচ তীক্ষ্ণ কিছু অদৃশ্য থেকে যাচ্ছে? কোথাও কি কোন একটা সুস্পষ্ট কারণ আছে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু ঠিক ধরে উঠতে পারা যাচ্ছে না?

না, সে কথা এখনো নহে-(শ্যামা-কবিগুরু)। এখন শুধু সাক্ষ্য, নারীর সাক্ষ্য। আয়াতগুলো দেখানো হয়েছে গত নিবন্ধে। এখন দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক আর এক দিকে। যেটা নিয়ে সাক্ষ্য সেটা হল ব্যাভিচার, পুরুষ-নারীর পারস্পরিক সম্মতিক্রমে অবৈধ পরকীয়া। সারা কোরাণে মাত্র একটা শব্দ দিয়ে দু’জনকে-ই অপরাধী বলা হয়েছে, জেনা। শারিয়ায় জেনা শবটার ব্যাখ্যা কি?

“কোন পুরুষ ও নারী পরস্পরের সহিত বৈধ বিবাহে আবদ্ধ না হইয়া যদি ইচ্ছাকৃতভাবে শারীরিক সংসর্গ করে তবে তাহার জেনা করিয়াছে বলিতে হইবে”। - শাস্তি - মৃত্যু বা এক’শ বেত্রাঘাত। আর ধর্ষণ হল জেনা-বিল-জাব্র। “একপক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সম্মতি ব্যতীত, জোর করিয়া সম্মতি আদায় করিয়া (ইত্যাদি) সংসর্গ করিলে তাহা জেনা-বিল-জাব্র হইবে - ধর্ষকের শাস্তি মৃত্যু বা এক’শ বেত্রাঘাত”।

{ পাকিস্তান হুদুদ অর্ডিন্যান্স, সেকশন ২০, ১৯৮০- (৫এর ১-এ-বি, ২ এবং ৩) ও (৬ এর ১-এ-বি-সি-ডি, ২ এবং ৩-এ-বি) }

চমৎকার, তাই না? এই তো হল ন্যায়বিচার। ধর্ষক শালাদের শাস্তি তো হওয়াই উচিত, পারলে মৃত্যুর চেয়েও কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত। “ব্যটারে শুলে বিঁধে, কারার মাঝে করিয়া রাখো রুদ্ধ”- (কবিগুরু)। কিন্তু শারিয়ার আইনে ঘাপলাটা আছে এর পরেই, মহা ঘাপলা আছে। এইসব মারাত্মক অন্যায়ের জন্যই শারিয়া হয়ে উঠেছে মুসলমানের কপালে কলংকতিলক। না হলে, সুবিচারের আইনের খোঁজে মানুষ তো চিরকাল হন্যে হয়েই ছিল। শারিয়া যদি তা দিতে পারত তাহলে শুধু মুসলমান কেন, সারা মানবজাতি নিজের গরজেই শারিয়া প্রতিষ্ঠা করে ফেলত যেমন করেছে মাননাধিকার দলিলের ১৮ নম্বর আর্টিকেল-এ। সে সম্ভাবনাটা-ও তখন ছিল, যদি শুধু কোরাণের কন্টেস্টচুয়াল আয়াতগুলো না দিয়ে নরম্যাটিভ আয়াতগুলো দিয়ে শারিয়া বানানো হত।

সেকশন ৮, এ-বি। “হুদুদের শাস্তিযোগ্য জেনা বা জেনা-বিল-জাব্র এর প্রমাণ হইবে নিম্নলিখিত দুইটির একটিঃ-

(এ) অভিযুক্ত যদি কোর্টে অপরাধের স্বীকারোক্তি প্রদান করে।

(বি) কমপক্ষে চারিজন বয়স্ক মুসলমান পুরুষ যৌনকর্মের চাক্ষুষ সাক্ষ্য দেয়, যাহাদের প্রতি কোর্ট সন্তুষ্ট (তাজকিয়াহ আল-শুহদের ব্যাপারে ইত্যাদি)”।

হল? সাফ কথা। শুধু পারস্পরিক সম্মতির উত্তপ্ত পরকীয়াতেই নয়, বলপূর্বক ধর্ষণেরও সাক্ষী লাগবে ওই চারজন মুসলমান পুরুষ।

ফলাফল? ফলাফল ভয়াবহ নিম্নচাপ (ঢাকার নাটক)। কারণ এ আইন অলস বাক্য নয়, এ আইনের বিষাক্ত ছোবলে বাস্তবেও মর্মভেদভাবে নিষ্পেষিত হয়েছে এবং আরও হবে আমাদের অনেক হতভাগিনী ধর্ষিতা বোন। আমরা আল্লাহর আইনের নামে ওদের লিঙ্গা করে দিয়েছি এবং আরও দেব। আর জামাতের দাঁড়ি-টুপি-আলখাল্লা দেখে নুরানী চেহারায় মুখস্থ করা দু’টো আরবী কলমার সাথে মুখস্থ করা বাংলা তর্জমা শুনে ভুলব। এখনো আমরা রুখে না দাঁড়ালে আবার ছোবল দেবে এ সাপ, আমাদেরই অলসতার গাফিলতির জন্য। অ্যাকশনের



যদি দায়িত্ব থাকে, ইন্যাকশনেরও দায়িত্ব থাকবে মানুষের আদালতে না হলেও অন্য কোথাও।  
ছাড় নেই, আমাদের কোন পরিত্রাণ নেই সেখানে।

হুদুদের মামলাগুলো হল ফৌজদারী। ফৌজদারী মামলাতে সাধারণভাবে চাক্ষুষ সাক্ষী পাওয়া যায় না, পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ওপর নির্ভর করে অপরাধীকে শাস্তি দিতে হয়। কিন্তু হুদুদ শুধু চাক্ষুষ সাক্ষী-নির্ভর, পারিপার্শ্বিক প্রমাণের কোন কথাই হুদুদে নেই। কোরাণেও নেই। হুদুদ ছাড়া শারিয়ার অন্য যে অংশ তাজি'র, সেখানে হয়ত ওটা চলবে। কিন্তু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যাবে না বলে হুদুদে পারিপার্শ্বিক প্রমাণ যোগ করা অসম্ভব। পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ওপর নির্ভর করে হুদুদ মামলায় কোনদিন কারো শাস্তি হয়েছে কি? আমি জানি না, সম্ভবতঃ সেটা সম্ভবই নয়।

এবার রহস্যের নটে শাকটি মুড়োতে হয়। ধর্ষণ বা পরকীয়ায় অদৃশ্য ভূত-পেতলী ছাড়া চারজন মানুষের সাক্ষী পাওয়াটা যে অসম্ভব, তার প্রমাণের দরকার হয় না। কোরাণের এই ব্যবস্থা আসলে যে সত্যি সত্যি ওই অসম্ভবের জন্য নয়, ওটা যে বিবি আয়েশার আর অন্যান্য নারীদের ওপরে নাহক অপবাদের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ ছিল, এবং সেই রক্ষাকবচকে এখন কি নিষ্ঠুরভাবে নারীর গলার ফাঁস বানানো হয়েছে, তা-ও প্রমাণ সহ দেখানো হয়েছে আগের নিবন্ধে।

কিন্তু ধর্ষণ?

তাবারি-বোখারি-ইমাম শাফি'ই-হেদায়া-ইবনে হিশাম-ইসাকের বহু হাজার পৃষ্ঠা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখা হয়েছে। ইসলামের ওই ইতিহাসগুলো বিজয়ী মুসলিমদেরই লেখা ইতিহাস। শত শত লোকের হাঁচি-কাশির পর্যন্ত উল্লেখ রয়েছে ওগুলোতে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনার অতি-বিস্তারিত একঘেয়ে বিবরণের জন্য ওগুলো পড়াই দায়। অমুসলিমের বহু অপরাধের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে ওগুলোতে, ধর্ষণের মত গুরুগম্ভীর ঘটনা ঘটলে অবশ্যই লেখা থাকার কথা। কিন্তু কোথাও কোন ধর্ষণের কথা নেই। সারা কোরাণেও ধর্ষণ সম্বন্ধে কিছু বলা নেই, যা আছে সবই পরকীয়া বা পরকীয়ার অপবাদ সম্বন্ধে। তাই কোরাণে ধর্ষণের ওপর কোন আইন নেই। সেটাই স্বাভাবিক, যা ঘটেনি তা নিয়ে আইন হয় না।

এই দুই কারণে শারিয়ার আইনে ধর্ষণকে পরকীয়ার পর্যায়ে ফেলে দেয়াটা মুসলমানের জন্য সাংঘাতিক আত্মঘাতী হয়েছে। যত অবিশ্বাস্যই মনে হোক, এর জন্য ধর্ষিতাকে স্বভাবতঃই চার সাক্ষীর অভাবে পরকীয়ার দোষে দোষী হতে হয়। এবং একই শাস্তি পেতে হয়, মৃত্যুদণ্ড বা বেত্রাঘাত। দোষ ফতোয়াবাজের নয়, দোষ সম্পূর্ণটাই শারিয়ার। বাস্তব প্রমাণ দেখাব দূরের নাইজিরিয়া-পাকিস্তান থেকে তো বটেই, দেখাব কাছের বাংলাদেশ থেকেও। কারণ প্রায়ই আমাদের “**দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা**” ফেলিয়া .....”।

আল্লার আইন, তাই না? আল্লার আইন অত্যাচারিতাকে শাস্তি দেয়, তাই না?  
বটে!!

\*\*\*\*\*

**Saryay narl-saQI**

(5- সমাপ্ত)।

এই কালরাত্রি চিরকাল থাকবে না। একদিন এক নুতন সূর্য উঠবেই। একদিন পৃথিবীর সব মুসলমান তাদের নিরপরাধ বোনদের ওপর হাজার বছর ধরে এই বর্বর নিষ্ঠুরতা, এই অসহ অপমান উপলব্ধি

করবেই। সেদিন পৃথিবীর সব মুসলমান ভাই, -অনেক আদরে,- তাদের শতাব্দী-লাঞ্ছিতা বোনদের বুকে তুলে নেবে। বেত্রাঘাতে প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত তাদের রক্তাক্ত শরীর থেকে রক্ত মুছিয়ে দেবে, তাদের চোখের অশ্রু মুছিয়ে দেবে। তারপর হাত জোড় করে নিজেদের অপরাধের জন্য তাদের কাছে ক্ষমা চাইবে, দূর করে ফেলে দেবে ইসলামের নামে অনৈসলামিক এই অভিশপ্ত শারিয়া আইন। সেদিন নিশ্চয়ই খুব বেশী দূরে নয়।

নিরপরাধ অত্যাচারিতের বুকফাটা অভিশাপ বড় কঠিন জিনিস। আল্লাহ'র আরশ কাঁপিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে সেটা, একটা জাতিকে শূন্যে তুলে আছাড় দেবার ক্ষমতা রাখে। বিশ্ব-মুসলিমকে ইসলামের নামে সেই হাড়ভাঙ্গা আছাড়ই দিয়েছে রাজনৈতিক ইসলাম। শারিয়ার আইনগুলো আগেই দেখানো হয়েছে, এবারে আমরা কিছু শারিয়ার ভুক্তভোগীদের অবিশ্বাস্য বাস্তব আবারও দেখাব। মুখে যে যা-ই বলুক এগুলো খাঁটি শারিয়া আইন, কোন রকম ভুল ব্যাখ্যা নয়।

১। ধর্ষণকারী, না ধর্ষিতা? ৩০শে আগস্ট, ২০০২,  
দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক যুগান্তর, পাঠকের পাতা, এন-এফ-বি।

(ভাবানুবাদ) এ ধরণের ঘটনা অত্যন্ত মমবিদারক। তার পরেও কি করিয়া এমন একটা ঘটনা বাস্তবে সম্ভব হইল তাহা আমাকে উদ্ভিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী মানিকগঞ্জে এক ১৩ বছর বয়সের বালিকা তার বদমাশ সৎ-পিতা দ্বারা ধর্ষিতা হয়। গ্রাম্য-বিচারের ভিত্তিতে স্থানীয় বর্ষিয়ান ব্যক্তিগণ ধর্ষক এবং ধর্ষিতা দুইজনকেই জুতা দ্বারা প্রহার করিতে করিতে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দেয়। মানিকগঞ্জ জেলার গাড়পাড়া ইউনিয়নের তেঘুরি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

আল্লার আইন, তাই না? আল্লার আইনে ধর্ষিতা হতভাগিনী কচি বালিকাকে জুতো-পেটা হতে হবে, তাই না?

2. <http://bangladesh-web.com/news/jul/01/n01072002.htm#A5>

১লা জুলাই, ২০০২:- উদ্ধৃতি:- ফতোয়া দ্বারা ধর্ষিতাকে ৮০ বেত্রাঘাত - একজন আটক, দুইজন পলাতক।

সিরাজগঞ্জ- ৩০শে জুন ইউ-এন-বি। সালাঙ্গা থানার চক গোবিন্দপুর গ্রামে সালিসী সভায় ফতোয়া দ্বারা ধর্ষিতা জয়গুন বিবিকে আশীটি বেত্রাঘাত, এবং ধর্ষণকারী হাফিজুর রহমানকে আশীটি বেত্রাঘাত ও দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। বিশ বছর বয়স্কা স্বামী-পরিত্যক্তা জয়গুন তাহার পিতার বাড়ীতে থাকিত। জুন মাসের চার তারিখে গভীর রাত্রে হাফিজুর চার-পাঁচ জন সঙ্গীসহ জয়গুনকে জোরপূর্বক উঠাইয়া নেয় এবং তারাস উপজিলার বিনোদ গ্রামের এক বাড়ীতে রাখিয়া বার দিন ধরিয়া ক্রমাগত ধর্ষণ করে। হাফিজুরের আত্মীয়রা ১৬ই জুন হাদিগকে চক গোবিন্দপুরে ফিরাইয়া আনে এবং পরদিন সালিসীর ব্যবস্থা করে। মওলানা আবদুল মান্নান এবং গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিগণ ধর্ষণকারী ও ধর্ষিতাকে সমান বেত্রাঘাতের শাস্তি দিলে গ্রামে লোকের মনে প্রশ্নের উদয় হয়।-উদ্ধৃতি শেষ।

হ্যাঁ, লোকের মনে মোলায়েম মসৃণভাবে চমৎকার ললিত-প্রশ্নের উদয় হয়। কিন্তু রাগে দুঃখে কেউ ফেটে পড়ে না, এই বিষাক্ত আইনের গলা কেউ চেপে ধরে না। আমাদের মৃত আত্মার জাতি, তাই। না হলে এসব দেশে এরকম ঘটনা ঘটলে একটা দেশের লোকেরা আকাশ-পাতাল করে ছাড়ত, চক্ৰিশ ঘন্টার মধ্যে সরকারকে আর আদালত সমেত এই আইনকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত।

৩। সাপ্তাহিক দেশে বিদেশে:- ১৫-ই মার্চ ২০০২:-

চান্দাইকোনা ইউনিয়নের ঐখোলা গ্রামের এক দিনুজুরের দুই কিশোরী কন্যা (১০ ও ১২ বছর) প্রায় এক বছর আগে বেলকুচি উপজিলার খুকলি গ্রামে এক তাঁত ব্যবসায়ীর বাড়িতে কাজ নেয়। ঐ সময় দুই বোন শ্রীলতাহানীর শিকার হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রায় এক বছর পর গ্রাম্য মাতব্বর আবদুর রহমান খান এবং আছাব

আলী গত ৬-ই মার্চ সালিসী ডাকেন। সালিসী বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মাতব্বর আছাব আলী। আর ফতোয়া দেবার জন্য ডেকে আনে তুমরাই দাখিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মওলানা আবুবকর সিদ্দীক-কে। মওলানা আবু বকর দুই বোনের মধ্যে বড় বোনের মুখে সম্ভ্রম হারানোর ঘটনা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং তাৎক্ষণিক ভাবে ফতোয়া দিয়ে তাকে ১০১ ঘা দোররা মারার নির্দেশ দেন। সেখানে উপস্থিত জেল হোসেন নামে এক ফতোয়াবাজ দোররা মারা শুরু করে। প্রায় ৫০ দোররা মারার পর ঐ কিশোরী অজ্ঞান হয়ে যায়। পরে তাকে সুস্থ করে বাকি ৫১ দোররা কার্যকর করে নুর ইসলাম নামে আর এক পাষন্ড। এ অবস্থায় ঐ কিশোরী জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকে মাটিতে। বড় বোনের শাস্তি দেবার পর ছোট বোনের শাস্তি নির্ধারণের জন্য আবার বৈঠক শুরু হয়।

আল্লার আইন, তাই না? আল্লার আইনে ধর্ষিতা হতভাগিনীদেরকে বেত খেতে হবে তাই না?

৪। দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০ই জুলাই ২০০৩এর খবর। আবারও শারিয়ার বিষাক্ত ছোবলে জুতোপেটা হয়েছে এক ধর্ষিতা। মাদারীপুরের ঘটমাঝি গ্রামের মোফাজ্জল মাতব্বরের পুত্র তোফাজ্জল মাতব্বর তিন সন্তানের মা'কে ধর্ষণ করে। ধর্ষক ধরা পড়ে ও সালিসিতে অপরাধ স্বীকার করে। চরমোনাই পীরের মুরীদ আলী খাঁ'র সভাপতিত্বে রায় কার্যকর করা হয়, ধর্ষিতাকে ও ধর্ষককে ৪০ জুতোপেটা, আর ধর্ষকের আরো পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা। সালিসশীরা ধর্ষিতাকে তওবা পড়িয়ে স্বামীর হাতে তুলে দিতে চাইলে স্বামী তার স্ত্রীকে গ্রহণ চায় নি, পরে চাপের মুখে গ্রহণ করেছে। পীরের মুরিদ বলেছে, এ রায় নাকি সমাজের শাস্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে দেয়া হয়েছে, শারিয়া-মোতাবেক দেয়া হয় নি।

পীরের মুরীদ যা-ই বলুক, তার রায় শারিয়ার আইন এবং অন্যান্য ঘটনার রায়ের সাথে হুবহু মিলে যায়। নিজের হাতে আইন তুলে নেয়ার অপরাধের উপলব্ধিও তাদের নেই। আমাদের মৃত জাতির মৃত আত্মা, তাই। নাহলে এসব দেশে এমন একটা ঘটনা ঘটলে হুলস্থূল বাধিয়ে দিত দেশের মানুষ, আকাশ পাতাল করে ছাড়ত। মানুষের বাচ্চা হলে এসব ঘটনা শুনে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠার কথা। অনেকের ওঠেও। কিন্তু কেন যেন কেউ কিছু করতে পারেননা। ওপরের উদাহরণগুলো গ্রাম বাংলায় ঘটেছে বলে কেউ কেউ বলেন, "ওগুলো হল মূর্খ মোল্লাদের দেয়া ফতোয়া। ওটা আসলে ইসলামী আইনই নয়, ওরা ইসলামের কিছুই জানেনা"।

যদি ওরা ইসলামের কিছুই না জানে, তবে এত শত শত মা-বোনের আত্মনাশ-হাহাকার শুনেও ইসলামের পতাকাধারী জামাত চোখ কান বন্ধ করে এত বছর স্নেহ বসে থাকল কেন? ওই সব মূর্খ মোল্লাদের হাত থেকে ফতোয়া দেবার অধিকার কেড়ে নিজেদের "জ্ঞানী" হাতে নিল না কেন? কারণটা দেখানো হয়েছে আগের নিবন্ধে শারিয়ার আইন উদ্ধৃত করে। নিল না কারণ নেয়া সম্ভব নয়। কারণ যত অবিশ্বাস্যই হোক শারিয়াতে ওই আইনই লেখা আছে। ধর্ষণের মামলায় চারজন বয়স্ক মুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষ্য ছাড়া ঐ হতচ্ছাড়া নারীখেকো পুরুষকে শাস্তি দেয়া ইসলামী আইনে সম্ভবই নয়। আর, নালিশ করতে এসে স্বীকারোক্তি অথবা অন্তঃসত্ত্বা হবার কারণে ধর্ষিতা হতভাগিনীর কপাল পোড়ে। কারণ ওভাবে সে "অপরাধী" হিসেবে প্রমাণিত হয় এবং আদালতে শাস্তি পায়। মোল্লারা যত মূর্খ-ই হোক, শারিয়ার আইন নিয়ে খেলা করার মত বুকের পাটা ওদের বাপেরও নেই। ওরা শুধু ভক্তিভরে তা-ই প্রয়োগ করে যা শারিয়াতে লেখা আছে। সেজন্যই একই আইনে বাংলাদেশের ধর্ষিতা বালিকারা অবিবাহিতা হওয়ায় জুতো আর চাবুক খেয়েছে আর নাইজিরিয়ার আমিনা লাওয়াল, পাকিস্তানের জাফরান বিবি বিবাহিতা হওয়ায় পেয়েছে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড।

“ডেভিড ফিনকেল, ওয়াশিংটন পোস্ট স্টাফ রাইটার, রবিবার নভেম্বর ২৪, ২০০২, পৃষ্ঠা এ-০১- (বাচ্চাসহ আমিনা লাওয়ালের ছবির নীচে লেখা আছে- ভাবানুবাদ):- আমিনা লাওয়াল, যাকে সন্তান জন্মের পরপরেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। কিন্তু যে পুরুষ তাকে গর্ভবতী করেছে বলে সে কোরাণ ছুঁয়ে শপথ করেছে, সে ব্যক্তির কোনই শাস্তি হয়নি কারণ প্রয়োজনীয় চার বয়স্ক মুসলমান ব্যক্তি পাওয়া যায়নি যারা স্বচক্ষে এ সংসর্গ দেখেছে।”

এবার তাকানো যাক আমাদের প্রাক্তন দেশের দিকে, পাকিস্তান যার নাম। ১৯৭৯ সাল থেকে সেখানে শারিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সরকারী আইন হিসেবে। "মধ্যপ্রাচ্যে নারী-অধিকার প্রতিরোধ কমিটি"-র নম্বর-৩, জুলাই ২০০২ বুলেটিন থেকে:- (ভাবানুবাদ- আরও বহু বহু যায়গায় এ ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ আছে):- পাকিস্তান, ১৭-ই এপ্রিল। (ধর্ষনের শিকার) জাফরান বিবিকে ইচ্ছাকৃত অবৈধ যৌনতার অভিযোগে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। ১৯৮১ সাল হইতে নারী-সংগঠন এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলি এই আইন রহিত করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করিতেছে।

এ ধরনের মামলায় সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্টের জজ-সাহেব জাফরান বিবিকে ছেড়ে দিয়ে বলেছেন, কুমারী বা বিধবাদের অন্তঃসত্ত্বা হওয়াটাই শারীরিক সংসর্গের প্রমাণ নয়। হজরত ঈসার পদ্ধতিটা আবার ফিলে এল নাকি পাকিস্তানে, সাধারণ মানুষের জন্য? নাকি পাকিস্তানের গম্বুথ্রামে ক্লোনিং বা টেষ্ট-টিউব-বেবি শুরু হল? সুপ্রীম জজ সাহেবের আসল যন্তনাটা যে কোথায়, সেটা বোঝা যাবে তাঁর পুরো রায়টা পড়লে। জাফরান বিবিকে ছেড়ে দিতে তিনি পাগলের মত শারিয়ার যুক্তি খুঁজেছেন, কিন্তু পান নি। শেষমেষ ওই অসম্ভব বাহানাই সই, কারণ গরজ বড়ই বালাই। আন্তর্জাতিক চাপের নাম বাবাজী, সেখানে পাকিস্তানের হুকো নাপিতের ব্যাপার আছে। তা ছাড়া ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আর আই-এম-এফের সামনেও পাকিস্তানকে স্লো-পাউডার মেখে মুখটা দেখাতে হয়। যতদিন আন্তর্জাতিক চাপ গড়ে ওঠেনি, ততদিন নীচের দু'দুটো কোর্টে হতভাগিনী ধর্মিতার মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে শারিয়ার জয়গান গেয়েছে। পৃথিবীব্যাপী তুমুল প্রতিবাদের পরে প্রেক্ষিতে পরে জাফরান বিবিকে মুক্তি দেয়া হলে বিশ্বে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। এতে প্রমান হল যে শারিয়া ইসলামের এমন কিছু লক্ষণরেখা নয়, ওটাকে বাদ দেয়া খুবই সম্ভব এবং তাতে ইসলামের দাবী যে মানবাধিকার, সেটা রক্ষিতই হয়। এগুলো আমাদের গ্রাম বাংলার মুখ মোল্লার অপকর্ম নয়, এ হল দু-দুটো ইসলামী দেশের শারিয়া কোর্টের রায়। আজ এগুলো ঘটতে পারছে কারণ গতকাল এবং গত পরশু আমাদের বাপ-চাচারা এ দানবকে উচ্ছেদ করেননি। আজ যদি আমরাও অলস বসে থাকি তবে আগামী কাল, পরশু এবং অনন্তকাল ধরে এ কালনাগ আমাদের বাচ্চাদের ওপর ক্রমাগত তার মরণছোবল দিতে থাকবে, অগণিত নিরপরাধ অত্যাচারিতার দীর্ঘশ্বাসের অভিশাপে ভারাক্রান্ত হতে থাকবে আমাদের ভবিষ্যত ইতিহাস।

এসব নিষ্ঠুরতার জন্যই শারিয়া পৃথিবীর ভয়ংকরতম আইন, শারিয়া ভিত্তিক রাজনৈতিক ইসলাম পৃথিবীতে হানাহানি ফিৎনা সৃষ্টিকারী ভয়ংকরতম ধর্ম-বিশ্বাস। “আর ধর্মের ব্যাপারে ফিৎনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ” - সুরা বাক্বারা আয়াত ২১৭।

অতঃপর, একজন বিবেকবান মানুষ হিসাবে, বেত্রাঘাতে প্রস্তরাঘাতে জর্জরিতা নিরপরাধ ভগ্নীর প্রিয় ভগ্নী ও ভ্রাতা হিসাবে আর কোন কোন প্রমাণ তুমি অস্বীকার করিবে?

\*\*\*\*\*

সমাপ্ত।